ভূমিকা।

রামমোহন রায়ের মতের উদারতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মত যে অত্যন্ত উদার ছিল তাহা লেখক স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিবাদকারিগণ পুনর্ব্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

রামমোহন রায়।

সাধারণতঃ আমরা প্রতিদিন গুটিকতক ছোট ছোট কাজ লইয়াই থাকি, মাকড়ষার মত নিজের ভিতর হইতে টানিয়া টানিয়া আমাদের চারিদিকে স্বার্থের জাল নির্ম্মাণ করি ও স্ফীত হইয়া তাহারই মাঝখানটিতে ঝুলিতে থাকি, সমস্ত জীবন দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে সমাহিত হইয়া অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতার গর্ত্তে স্বচ্ছন্দসুখ অনুভব করি। আমাদের প্রতিদিন পূর্ব্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি ধারাবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতি দিবসের উদরপূর্ত্তি প্রতিরাত্রের নিদ্রা—বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন শ পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্ত্তন এই ত আমাদের জীবন—ইহাতে আমাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না; অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের অভাব নাই বটে কিন্তু আপনাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নাই। এক-

প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় জীবাণু আছে সে কেবল গতি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেই জানে, সে সমস্ত জীবন একই ঘুরন ঘুরিতেছে, তাহার সহিত আমাদের বেশী প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমাদের আহ্নিক গতি আছে বার্ষিক গতি নাই—আমরা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছি নিজের নাভিকুণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছি কিন্তু অনন্ত জীবনের কক্ষপথে এক পা অগ্রসর হইতেছি না। এই পরম কৌতুকাবহ আত্ম-প্রদক্ষিণ-দৃশ্য চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—সকলে মাটির উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রচনা করিয়া লাটিমের ন্যায় সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমির মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রমণ নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। প্রতি-দিন চারিদিকে ইহাই দেখিয়া মনুষ্যত্বের উপরে আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়—সুতরাং মনুষ্যত্বের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার বল চলিয়া যায়। এই জন্য মহাত্মাদের প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। মহাত্মাদের জীবন আলোচনা করিলে মনুষ্যত্ব যে কি তাহা বুঝিতে পারি, "আমরা

মানুষ" বলিলে যে কতখানি বলা হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, জানিতে পারি যে আমরা কেবল অস্থি-চর্ম্মনির্ম্মিত একটা আহার করিবার যন্ত্র মাত্র নই, আমাদের সুমহৎ কুলমর্য্যাদার খবর পাইয়া থাকি। আমরা যে আমাদের চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ মনুষ্য, সাধারণ মানুষদের চেয়ে যে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ইহাই মনের মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমাদের মাথা তুলিতে ইচ্ছা করে, মৃত্তিকার আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্য সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রম-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদের যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই

তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদের শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদের 'আমার' বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন "মিল্টন, আহা তুমি যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে

স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাঁহার মহত্ত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে মস্তলোক মনে করিয়া নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে স্ফীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোট ছোট মস্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় যশবুদ্বুদদিগকে, বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্প চন্দন দিয়া মহত্ত্ব পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি! এজলাষ হইতে জোন্স্ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেমস্ সাহেব

আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমাল্য দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না। কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছি ও প্রতিদিন তিন-বেলা তিনটে করিয়া নূতন নূতন মৃৎপ্রতিমা নির্ম্মাণে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রাম-মোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার আর-

একটি গুরুতর আবশ্যক আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি "রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গ-দেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও! আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্র-গৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!"

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আরেক্‌টা কথা দেখিতে হইবে। একেকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া

যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়; অনেকে মিলিয়া হোহা করিয়া একটা কাজের কারখানা বসাইয়া দেন, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজেতে মত্ততাসুখ ছিল না, অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইবার হাঁসফাঁস করিবার আনন্দ ছিল না, একাকী অপ্রমত্ত থাকিয়া ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, তাঁহার সঙ্কল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে সুধীরে তাঁহার গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। ব্যস্ত-সমস্ত চটুল স্রোতস্বিনীতে যেমন দেখিতে দেখিতে আজ চড়া পড়ে কাল ভাঙ্গিয়া যায়,—সেরূপ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া

কাজ যত না হউক খেলা অতি চমৎকার হয়,—তাঁহাদের সে কালে সেরূপ ছিল না। মহত্ত্বের প্রভাবে হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোন কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল! তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই; তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন,

তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্ম-স্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল,' বঙ্গভাষা বল' বঙ্গসাহিত্য বল,' সমাজ বল,' ধর্ম্ম বল' কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? কোন্ কাজটাই বা তিনি ফাঁকি দিয়াছিলেন? বঙ্গসমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণ-স্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে

সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না ?

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানি-

লেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণ-পণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখনত দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধা পান করত এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্য দ্রব্য হইয়া উঠে, ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ নামটা বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তাণি করিবার সরঞ্জাম করি। স্তুতি] কোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণ শব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে

করিতে থাকি বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয় আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী রকমের বড় লোক তাঁহারা নিজের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে কিন্তু তৎ-সঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতি-যোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল ,লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কথায় কথায় তাহার পরি-বর্ত্তন হয়। কিছু কিছু ভাল কাজ সে করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপ-

নার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে সেও যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা জীবন্ত ভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়-পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লঘু আত্মাই প্রবাহে ভাসিয়া

উঠে ভাসিয়া যায়। যাঁহার আত্মার গৌরব আছে তিনিই প্রবাহে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের এই আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহা নিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয় ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন ব্যক্তি সহজে ধারণ করিতে পারে? কোন বালক ত পারেইনা। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন এই জন্য এই জ্ঞানের বন্যায়

তাঁহার হৃদয় অটল ছিল, এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরাত ধৈর্য্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রাম-মোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি ফুঁ দিয়া দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া যাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভস্মের মধ্যে যে অগ্নি-কণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর নিভিবে না। এত বল এত ধৈর্য্য নাহিলে তিনি রাজা কিসের? দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লির সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসমাজের মধ্যে

তিনি তাঁহার রাজ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে আমরা কি তাঁহাকে সম্মান করিব না?

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতিবড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন

নিরুপায় যেমন অসহায় এমন আর কোথায় ! রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই অস্তিত্ব নাই কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্প বধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রবলতর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া

উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগ-পাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এই জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবলপ্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্গচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেষা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের যেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল।

তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ মনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ

লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্ব্ব প্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রামমোহন রায়—তাঁহারত এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন-কার অন্ধকার হিন্দুসমাজে আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণ স্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতে-ছিল, সেই মৃতভার সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড-বলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দু-ধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেব-প্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্র ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোট বড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম সকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন, সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা-

সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝ খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টিয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়ত দুয়েকটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষি-দের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করি-বার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকল ধর্ম্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল—তিনি ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্ম্মাগ্নি আহরণ করিতে পারিতেন; তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষেরই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে

প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান দর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার লাভ করিবার সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহ-ভিত্তিতে ঢুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক না হইত তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম না কি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এই জন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারত-বর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে

আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন, সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও

না কিন্তু অবস্থা ও সাধনা বিশেষের গুণে ইহা বিশেষ-রূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী। আমি যদি উদা-রতাপূর্ব্বক বলি, খৃষ্টধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, মুসলমান ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটার গুণে তাহা কাণে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথাটা মিথ্যা কথা হয়। সুতরাং সত্যের অনু-রোধে মিথ্যা উদারতাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষিদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম, সমস্ত জগতে ইহাকে প্রচার করিতে হইবে, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষরূপে রোপণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষেরত দারিদ্র্যের অভাব নাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত হীনতার অন্ধকূপে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদের পৈতৃক সম্পদ যে ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন আছে রামমোহন রায় সেই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘা-টন করিয়া দিলেন, আমরা কি গৌরবের সহিত মনের সাধে আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে পারিব!

আমাদের দীনহীন জাতিকে এই একমাত্র গৌরব হইতে কোন্ নিষ্ঠুর বঞ্চিত করিতে চাহে? আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না? আমাদের ব্রহ্ম কি কেবল-মাত্র নীরস দর্শন-শাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্ম্মে আছে, আমাদের ধর্ম্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসোবৈ সঃ। তিনি রস স্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। কোহ্যে-বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরি-পূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নর-নারীর প্রেমে আনন্দ, এই জন্যই আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্

ন বিভেতি কদাচন— এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাইয়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে? এমন অসীম আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জ্জিত, ভারতবর্ষীয়দের উপার্জ্জিত আমাদের উপার্জ্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর আত্মা হইতেও আত্মীয়তর এমন আর কোন দেশের ঈশ্বর নহেন, রামমোহন রায় ঋষি-প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি স্পর্দ্ধিত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতেন তবে আমাদিগকে কতদূরেই ভ্রমণ করিতে হইত—তবে আমাদের হৃদয়ের এমন অসীম পরিতৃপ্তি হইত না, তবে সমস্ত ভারতবাসী বিশ্বাস

করিয়া তাঁহার সেই নূতন পথের দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিনি যে ক্ষুদ্র অভিমানে অথবা উদারতা প্রভৃতি দুই একটা কথার প্রলোভনে পুরাতনকে পরিত্যাগ করেন নাই, এই তাঁহার প্রধান মহত্ত্ব।

বাস্তবিক, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায় একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা বিশেষ হইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপণ করিলে, তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে না, তাহার ফুল হয় না, ফল হয় না, সে ক্রমে মরিয়া যায়। আমি ভারতবাসী যখন ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ডাকি তখন সেই দয়াময় শব্দ সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবাসীর বিরাট হৃদয় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা কুড়াইয়া লইয়া কি সুগম্ভীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উত্থিত হয়। আর অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যদি Merciful বলিয়া ডাকি তবে Webster's Dictionary-র গোটাকতক শুষ্ক-

পত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্ম্মর করিয়া উঠে মাত্র। অতএব ভাবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা খাটে না। আজকালকার অনেক ধর্ম্ম-প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে ইংরাজি "Faith" শব্দকে অনুবাদ করিয়া "বিশ্বাস" নামক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় যে হৃদয়ের অভাববশতঃ স্বদেশীয় ভাষার অমূল্য ভাবের ভাণ্ডার তাঁহাদের নিকটে রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বাস শব্দের বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রয়োগ আছে, কিন্তু ভক্তি শব্দের স্থলে বিশ্বাস শব্দের প্রয়োগ অসহ্য। অলীক উদারতার প্রভাবে স্বদেশীয় ভাবের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সস্তা কাপড় সহজে কিনিতে পাওয়া যায় তবে তাহার উপরে মাসুল বসাইয়া সেই জিনিষটাই আর এক আকারে বিলাত হইতে আমদানি করাইলে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা হয় সর্ব্বসাধারণে কি সে কাপড় সহজে পরিতে পায়? এক হিসাবে বিলা-

তের পক্ষে উদারতা করা হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উদারতা বলে না! আমি নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায় সেই স্বগৃহ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অথচ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহাকে অনুদার বলিতে চাওত বল! উদ্ভিজ্জ ও পশু মাংসের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজের জীবন আছে বলিয়া। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন

নাই তবে পারসীক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃত ভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক্ আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। তাও যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আমাদের জঠরানলেরও যেমন এমন সার্ব্বভৌমিক উদারতা নাই যে সমস্ত খাদ্যকে সমান পরিপাক করিতে পারে আমাদের হৃদয়েরও সেই দশা, কি করা যায় উপায় নাই। এই জন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আগে আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, তাহার পরে সার্ব্বভৌমিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর

তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গৃহদেবতা তিনি ভারতবর্ষের পিতা। তিনি ভারতের হৃদয়ের যত নিকট-বর্ত্তী তিনি ভারতের অভাব যত বুঝিবেন এমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা, জিহোবা গড অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ইহা বুঝিয়া-ছিলেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্ম্মান্তিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষে পড়িত না। পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এত-

দিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণস্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্ম-দর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়! তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া, ভারত ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে ঋষিদের জয়ে সত্যের জয়ে ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়।

—ঃ০ঃ—